সুইডেন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও সুইডেন

১৯৯৯ সালের ১৭ নবেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার পর থেকেই ফেব্রুয়ারি এলেই সুইডেনের বইয়ের দোকানগুলোতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। নতুন প্রকাশিত বই, পুরনো বইয়ের নতুন সংস্করণ, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রূপকথা-উপকথা, কবিতা, অনুবাদ মিলিয়ে বইয়ের দোকানগুলো স্তরে স্তরে সেজে ওঠে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে ফেব্রুয়ারি মাসের ২৪ থেকে দিন কয়েকের জন্য প্রায় প্রতিটি বইয়ের দোকানে ৪০ থেকে ৫০ ভাগ রিডাকশানে বই বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই দিনটির জন্য অনেক ক্রেতাই অপেক্ষা করেন। তাই দিনটি এলেই বিশেষ বিশেষ দোকানে ভোর ৬টা থেকেই কেনাকাটা শুরু হয়ে যায়, কেনাকাটা চলে রাত প্রায় ৯টা পর্যন্ত। ক্রেতার ভিড় আর নতুন বইয়ের সোদা গন্ধেই পরিবেশ হয়ে উঠে অন্যরকম। যেন আমাদের ২১-এর বইমেলা। সুইডিশরা বই পড়তে এবং কিনতে দুটোই পছন্দ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, এই সময় একজন সুইডিশ গড়ে ৫টি বই পড়ে থাকেন। তন্মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ উপন্যাস, ২৫ ভাগ থ্রিলার, ১৫ ভাগ তথ্যমূলক, দশ ভাগ শিশুসাহিত্য ইত্যাদি। সুইডেনের অন্যতম বৃহৎ ডিস্ট্রিবিউশান কোম্পানি 'স্যাম ডিস্ট্রিবিউশন' বিশেষ বিশেষ সময়ে দৈনিক প্রায় ৩ মিলিয়ন বই এবং পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করে থাকে। স্যাম ডিস্ট্রিবিউশনের মতো আরো প্রায় কয়েকশ' ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি রয়েছে সুইডেনে। যারা বই ও পত্র-পত্রিকা সরবরাহ করে থাকেন।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বা 'ইন্টারন্যাশনাল মাদার লাঙ্গুয়েজ ডে' নামটি সুইডেন তথা ইউরোপে ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু এই নামটির সঙ্গে যে একুশ এবং বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জড়িত, তা তেমনভাবে পরিচিত নয়। ৫২ বছর আগে ১৯৫২ সালের এই দিনটি বাঙালির রক্তে ভিজে জাতির জন্য একটি অনন্য দিবসের জন্ম দিয়েছিল। অর্ধ শতাব্দী সেই দিনটির প্রেরণায় পথ চলেছে গোটা বাঙালি জাতি। কিন্তু রক্তেভেজা এই ইতিহাস ইউরোপে ব্যাপকভাবে পরিচিত নয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' দিনটি ঘোষণার পরই ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছিল একুশের তাৎপর্য ও বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংবলিত তথ্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করতে। কিন্তু 'গ্রাম্য বিবাদে' লিপ্ত বাংলাদেশের কোনো সরকারই এই কাজটি করে উঠতে পারেনি। পারেনি একুশের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করতে বা পূর্ণাঙ্গ একটি ওয়েব সাইট ডিজাইন করতে। আজ বিশ্বে প্রায় ২০০টি দেশে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ৫ বছর ধরে পালন করা হলেও পেছনের ইতিহাস পেছনেই পড়ে আছে।

সেদিন হঠাৎ করেই একটি সুইডিশ বই হাতে আসে। বইটির নাম Den Forsta gangen Jag sag dej. বাংলায় বলা যায়, 'যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম।' লেখিকার নাম Katharina K. সুইডিশ লেখিকা। বইটি তরুণ-তরুণীদের প্রথম দেখার বা প্রথম আকৃষ্ট হবার ঘটনা নিয়ে লেখা। অর্থাৎ ছেলেটি মেয়েটিকে প্রথম দেখে কি ভাবলো বা মেয়েটি ছেলেটিকে প্রথম দেখে কি ভাবলো, প্রথম অনুভূতিটা হৃদয়কে কিভাবে নাড়া দিলো এবং কি করে তারা পরস্পর পরস্পরের কাছে এগিয়ে এলো- এই নিয়ে ছোট ছোট ঘটনা। লেখিকা খুব চমৎকার ভাষায় ছোট ছোট সুন্দর বর্ণিল শব্দে অনুভূতিগুলো ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি আবার সুইডিশ তরুণ-তরুণীদের মাঝে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং বিক্রি তালিকায় শীর্ষ স্থানটি দখল করেছে।

বইটি পড়ার পর আমারও বেশ লাগলো। বেশ কয়েকবার বইটি পড়লাম ও ভাবলাম বইটি বাংলায় অনুবাদ করলে কেমন হয়? এই ভাবনা থেকেই লেখিকা ক্যাথারিনার নাম-ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে তাকে একদিন সন্ধ্যায় টেলিফোন করলাম। নিজের পরিচয় দিয়ে বললাম, তোমার বইটি পড়েছি, ভালো লেগেছে। বইটি আমি বাংলায় অনুবাদ করতে চাই। লেখিকা বাংলার কথা শুনেই সুইডিশে বললেন, বেঙ্গলি? বাংলা? বাংলা কোনো ভাষা নাকি? কোথায় কথা বলে? লেখিকার কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। রিসিভারটা যেন কানের সঙ্গে এঁটে গেল। যে ভাষার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি, যে ভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি, যে ভাষায় সুইডিশ ভাষা থেকে প্রায় দশগুণ লোকে বেশি কথা বলে, আর তিনি বলছেন কি না বাংলা কোনো ভাষা নাকি? আর বাংলায় কোন দেশের জনগণ কথা বলে তাও তার জানা নেই। একটু ঘাবড়েই গেলাম। মনটাও বিষণ্ন হয়ে গেল।

তারপর তিনি বাংলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, পৃথিবীর কোন জায়গার লোক বাংলায় কথা বলে? বললাম, সমগ্র বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ার একাংশ বাংলায় কথা বলে। লেখিকা বাংলাদেশকে কতটুকু চিনলেন তা বোঝা গেলো না, তবে চিনলেন ইন্ডিয়াকে। তারপর তিনি আমার টেলিফোন নাম্বার রাখলেন এবং তার প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ করে আমায় জানাবেন বললেন। লেখিকার

কথা শুনে ভেতরে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। ভাবলাম, এমন একজন লেখিকা যার বাংলা ভাষা সম্পর্কে ধারণাই নেই, তার বই অনুবাদ করবো না। আবার ভাবলাম, বইটি বাংলায় অনুবাদ করে তাকে দেখাতে হবে বাংলাও একটি ভাষা এবং পরে তিনি হয়তো আরও ১০ জনকে বাংলা সম্পর্কে বলবেন।

ঘটনাটি হয়তো তেমন তাৎপর্যপূর্ণ নয়। লেখিকার জানা নাও থাকতে পারে। যেমন বর্তমান সময়ের শক্তিধর ক্লাউন গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ডব্লিউ বুশ পৃথিবীর বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম বলতে পারেননি। তবে তাৎপর্য এইটুকু যে একুশে এবং বাংলা ভাষার প্রচার যতটুকু হবার কথা ছিল, তা হয়নি। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার জন্য ঢাকার রাস্তা রক্তে ভেসে গিয়েছিল। এই খবর তৎকালীন উপমহাদেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই খবর গুরুত্ব সহকারে পরিবেশিতও হয়েছিল। কিন্তু এ খবরটি যে কারণেই হোক সুইডেনের কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়নি। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২২ ফেব্রুয়ারি বা ২৩ ফেব্রুয়ারির কোনো খবর কোনো সুইডিশ পত্র-পত্রিকায় নেই। খবরটা সুইডিশ পত্র-পত্রিকায় না থাকাটাও নেতিবাচক দিকটাই দেখা দেয়। হয়তো সুইডিশ মিডিয়া খবরটা পায়নি, হয়তো খবরটাকে স্যাবোটাজ করা হয়েছিল। হয়তো খবরটা স্যাবোটাজ করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার, নিজেদের স্বার্থেই। অনেক সুইডিশ বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আলাপ প্রসঙ্গে বলেছি ১৯৫২ সালের কথা, ভাষার জন্য রক্ত দেবার কথা। তারা বুঝতে পারেনি, ভাষার জন্য আবার রক্ত দিতে হবে কেন? শুনে সন্দেহ নিয়ে তাকিয়েছে, ভাবছে হয়তো জোক করছি। মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠা করার জন্যও যে রক্ত যেতে পারে, রাজপথে গুলি খেয়ে কেউ মারা যেতে পারে এই ভাবনাই তারা ভাবতে পারে না। কারণ 'সমি'রা সুইডেনে সংখ্যালঘিষ্ঠ এক জাতি। সুইডেন-নরওয়ে-ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উত্তর সীমান্তবর্তী এলাকায় এদের বাস। বল্গাহরিণ পালন, শিকার ও মাছ ধরাই এদের প্রধান জীবিকা। এই সমিদেরও নিজস্ব ভাষা আছে, সাহিত্য আছে, সংস্কৃতি আছে। সুইডেন তো তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, এই জন্য তো রক্ত দিতে হয়নি! পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ড, যার আয়তন ৮০ লাখ ৪০ হাজার স্কোয়ার মাইল, জনসংখ্যা মাত্র ৪৬ হাজার। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপটি ১৮১৫ থেকে ডেনমার্কের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হলেও ডেনমার্ক তাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্থানীয় অধিবাসী ইনুইটদের ভাষাকেই

টোকিও

একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন

বাঙালি জাতির মহান ভাষা আন্দোলনের স্মারক একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসের '৫২তম বার্ষিকী এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ৫ম বার্ষিকী উপলক্ষে জাপান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক বাংলা কমিউনিটি ম্যাগাজিন 'পরবাস' টোকিও কিতা ফুরিৎসু আকাবানে বুনকা সেন্টার (Kita-Ku, Akabane Bunka Center)-এ একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন ও উন্মুক্ত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানমালার প্রথমেই ছিল সব সংগঠন ও প্রবাসীদের পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন, কৃত্রিমভাবে ব্লাক আউট করে অস্থায়ী শহীদ মিনারে নগ্ন পায়ে

পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করছেন উত্তরণ কালচারাল গ্রুপ

সঙ্গীত পরিবেশন করছেন প্রবাসী শিল্পীবৃন্দ

সবার সমবেত কণ্ঠে একুশের করুণ সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গান গেয়ে এবং সারিবদ্ধভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে '৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন রক্তে রাঙা পুষ্পাঞ্জলিতে ছেয়ে যায় শহীদ মিনার। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্তরের প্রগাঢ় ভালোবাসায় স্মরণ করতে গিয়ে শান্তিকামী প্রবাসী বাঙালিরা উজ্জীবিত হয়েছিল টোকিওর এই দিনের অনুষ্ঠানে। এছাড়াও একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস এবং 'পরবাস'-এর বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বইমেলা, মুক্তিযুদ্ধের ছবি প্রদর্শনী, আবৃত্তি, ছোটদের জন্য অনুষ্ঠান এবং প্রবাসী শিল্পীদের কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করা হয়। ব্যস্ততার মধ্যেও মহান একুশের আনুষ্ঠানিকতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন 'পরবাসের' সম্পাদক কাজী ইনসান।

রাহমান মনি, rahman_moni@ny.tokai.or.jp

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রক্ততো দিতে হয়নি!

সঠিক তথ্য এবং সঠিক প্রচার সেহেতু সুইডিশ জনগণের কাছে বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এবং একুশ আলো-আঁধারের মধ্যে রয়ে গেছে। আজ থেকে বছর দুয়েক আগে সুইডেনের অন্যতম সুন্দর শহর সুন্দসভালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'নর্ডিক জার্নালিস্ট সিম্পোজিয়াম'। ওই সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন নর্ডিক দেশগুলোর বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত সাংবাদিকরা। সৌভাগ্যক্রমে ওই সিম্পোজিয়ামে আমন্ত্রিত ছিলাম আমিও। ওই সিম্পোজিয়ামে পরিচয় হয় নর্ডিক দেশগুলোর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক এবং তৎকালীন সুইডিশ গণতন্ত্রমন্ত্রী ব্রিত্তা লিয়নের সঙ্গে। পরিচয় পাবার পর ব্রিত্তা লিয়ন বলে ওঠেন, 'তাহলে তুমি তো বাংলাদেশ রিপ্রেজেন্ট করছো'। বলেছিলাম, 'তা হয় তো নয়, তবে আমি একটি বাংলা পত্রিকা রিপ্রেজেন্ট করছি সে সঙ্গে বাংলা ভাষাও।' ভাষার প্রশ্নেই উপস্থিত সবার ঔৎসুক্যটা বেড়ে যায়, কারণ নর্ডিক দেশগুলোর ভাষা একে অপরের কাছে পরিচিত, উচ্চারণে বা লিখনে পার্থক্য থাকলেও সবাই প্রায় বলতে ও বুঝতে পারেন, তবে তার মধ্যে বাংলা ছিল একেবারেই ব্যতিক্রম। ডিনার টেবিলেই আলাপ জমে উঠেছিল নর্ডিক দেশের বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে, টমাস ট্রান্সট্রয়মার, ইডিথ সোদারগ্রন, হ্যারি মার্টিনশন, সোনিয়া ওকেশন, বো-কর্পিলন, ইউরান প্লাম এঁদের নিয়ে। ওই সুযোগটা নিয়ে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ নির্মলেন্দু গুণ, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, রফিক আজাদ, মহাদেব সাহার কথা তুলেছিলাম। একমাত্র রবিঠাকুর ছাড়া আর কাউকে উপস্থিত কেউ চিনতে পারেননি। সবাই অনুযোগ করে বলেছিলেন বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের কোনো লেখা তারা পড়েনি, তবে পড়ার আগ্রহ আছে। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, তাদের কোনো বই কি সুইডিশে পাওয়া যায়? সুইডেনের বইয়ের দোকানগুলোতে সামান্যতম ইংরেজি বই বিক্রি হলেও ৯০ ভাগ সুইডিশ বই। এর মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যিকদের দু-একজনার বই পাওয়া গেলেও বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের বই একেবারেই অনুপস্থিত। বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের চিনতে না পারাটা সুইডিশদের ব্যর্থতা নয়, ব্যর্থতাটা আমাদের। আমরাই তাদের চিনতে দেইনি। যেমন তাদের জানতে দিইনি একুশের ইতিহাস।

Liakat Hossain
Kanalvagen 12 G, 191 34 Sollentuna
liakathossain@hahoo.com

জাপান

টাকার জন্য প্রাণ দিলো

আমি যখন কোরিয়া হানকুক ফরেন ইউনিভার্সিটিতে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করছি তখন এক বাংলাদেশীর সঙ্গে বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি। সে কোম্পানিতে কাজ করে। তার নাম সবুজ, জন্মস্থান কুমিল্লা জেলায়। সে মালিকের সঙ্গে কাজ করার সময় হঠাৎ মালবাহী ট্রাকের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয় এবং চিৎকার দিয়ে ওঠে। তখন 'সবুজ' মালিককে ধরতে যায় কিন্তু তার মালিক ইশারা দিয়ে তাকে ধরতে নিষেধ করে। 'সবুজ' বুঝতে পারে না। অন্য এক কোরিয়ান বলছে তুমি তাকে ধরো না, ইন্স্যুরেন্সের লোক এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, টেলিফোন করা হচ্ছে।

অ্যাম্বুলেন্স এসে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরের সপ্তায় আমি ও আমার এক কোরিয়ান বন্ধু সবুজের সঙ্গে তার মালিককে দেখতে যাবো, তাই বাস স্টেশনে গিয়ে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। এমন সময় আমার মোবাইল ফোনে রিং বেজে ওঠে, আমি রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে বলে, আমি মুক্তার। টিটু তুমি কোথায়? তোমারে খুব প্রয়োজন। আমি বললাম, চুংহা বাস স্টেশনে আছি তেনুং হাসপাতালে যাচ্ছি। ও বললো, তুমি যেয়ো না, আমরা ওখানে আসছি। সঙ্গীদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে একটু অপেক্ষা করতে বলি। আমি বাম পাশে তাকিয়ে দেখি হ্যাঁ, ৩/৪ জন বাংলাদেশী দেখা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন বেশি আলুঝালুভাব। কান্নাকাটি করছে। দেখে আমার ভেতরটা একেবারে কেঁপে ওঠে। আমি একটু এগিয়ে যাই, তখন কোরিয়ান বন্ধু বলে তুমি যেও না ওরা আসুক। ওরা কাছে আসে। তাদের মধ্যে তিনজন পরিচিত। আর যে কাঁদছে সে অপরিচিত। তারা পরিচয় দিয়ে বলল, এর নাম সিরাজ। ওর ছোট ভাই, দিনে কাজ করে রাতে কোম্পানির মালিকের বাসায় ঘুমিয়েছিল। ওই রাতেই কোম্পানিতে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখন তার ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশের রুমে দুই জন ইরানি ও কোরিয়ান ছিল। একজন ইরানি আহত অবস্থায় হাসপাতালে আছে। কোম্পানিতে এখন পুলিশ ভরে গেছে। তাদের কারো ভিসা নেই, সবাই ওভারস্টে। তাই কেউ গিয়ে খোঁজ করতেও পারছে না, জানতেও পারছে না। আমি শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যাই যাওয়ার জন্য এবং আমার সঙ্গে যে কোরিয়ান বন্ধু আছে সে ঠিক করে দেয় একজন উকিল। তাকে অনুরোধ করে আমার সঙ্গে নিলাম। কোম্পানির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার নিয়ে ট্যাক্সিতে করে রওনা হলাম। কোরিয়ান বন্ধু আমাকে বললো, আমাদের এখন ওই কোম্পানির মালিকের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না, কারণ তার এখন মাথা গরম, মন খারাপ, কথা বলা যাবে না। রাগ হয়ে যাবে। আমরা বরং ওই এলাকার ফায়ার সার্ভিস অফিসে যাই তাহলে আহত ও নিহতের খবর পাওয়া যাবে। ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে ঠিকানা নিয়ে তাদের অফিসে যাই এবং বিস্তারিত ঘটনা জানাই। তারা আমাদের কথামতো ঘটনা ফাইল করে। ফায়ার সার্ভিসের লোক আমাদের জানায়, ওই কোম্পানির মালিক বলেছে, বাসায় তিনজনই থাকতো, তাদের পাওয়া গেছে। তিনজন ছাড়া আর কোনো লোক ছিল না। আমরা বললাম সে মিথ্যা কথা বলেছে, বাংলাদেশী একজন অবশ্যই ছিল। ফায়ার সার্ভিসের লোক তদন্তের জন্য কোম্পানিতে যায় এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চে টেলিফোন করা হয়। বাসায় যে তিন জন ছিল তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোক এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তিনজনের মধ্যে একজন কোরিয়ান আর একজন ইরানি ও তার স্ত্রী। ইরানি খুবই গুরুতর আহত হয়েছে। তার মুখ ব্যান্ডেজ করা, পাশে তার স্ত্রী বসা। তারা কোরিয়ায় এসেছে বেশিদিন হয়নি। কোরিয়ান ভাষা তারা জানেই না। তার স্ত্রী বললো, আগে সে জাপান ছিল। আমিও জাপানি ভাষা জানি। জাপানি ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নজরুলকে দেখেছেন? সে বললো, আগুন লাগার সময় তার রুম খুলে দেখি কেউ নেই। তাদের কথা শুনে প্রশাসনের লোক কিছুটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা আমাদের বলে, খোঁজ নিয়ে দেখ, নজরুল তার কোনো বন্ধু-বান্ধবের বাসায় গেছে কি না? তাদের কথামতো নজরুলের ভাইকে নিয়ে পরিচিত অনেক বাসায় ফোন করা হলো। কোথাও নেই। প্রশাসনের লোকদের তা জানালাম। প্রশাসনের লোক আমার পরিচয় জানতে চাইলে আমি আমার স্টুডেন্ট কার্ড দেখিয়ে পরিচয় দেই। তারা সারা রাত হাসপাতালে ছিল। আর ওদিকে ফায়ার সার্ভিসের লোক ও প্রশাসনের লোক সারা কোম্পানি খুঁজে দেখছে নজরুলের মৃতদেহ। রাত ৩টার দিকে একটি মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এটা মানুষ ছিল নাকি অন্য প্রাণী ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। হাত এবং পা প্রায় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নজরুলের ভাই সিরাজের DNA-এর সঙ্গে মৃতদেহের DNA পরীক্ষা করার জন্য অন্য মেডিকেলে নিয়ে যায় ওই মৃতদেহ। রিপোর্ট বের হতে প্রায় তিন মাস সময় লেগে যায়। এর মধ্যে নজরুলের ভাই সিরাজ কেস ফাইল করে ফেলে লেবার কোর্টে। কিছুদিন সিরাজ ভাইকে আমি আমার বাসায় রেখে কাজ কিছুটা এগিয়ে দেই। সে তখন বলতো এক ভাই হারিয়ে আরেক ভাই পেয়েছি, তুমি আমার ধর্মের ভাই। আমি বললাম, আমি সব সময় আপনার পাশেই আছি এবং থাকবো। পরিশেষে নজরুলের মৃতদেহের DNA ও সিরাজের DNA মিলে যায়। এতে প্রমাণ হলো মৃতদেহ নজরুলেরই ছিল। সিরাজ ভাইয়ের পরিবার বাংলাদেশী টাকায় ১৭ লাখ টাকা পায়।

Sheikh K. Basher (Titv)
S.K. Kakidaira-336, Asugunkuzumatchi. Tochigiken
Japan. Tel : 0283-870332, E-mail-kbasher78@yahoo.com

কুয়েত

কুয়েতে একুশের শহীদ দিবস

একুশে ও মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে মুরগাবস্থ হোটেল গুলশানে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ও আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ময়েজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব আতাউল গনি মামুনের উপস্থাপনায় সভার কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর এক এক করে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এমাদুল হক খান, রবিউল আলম রবি, মোঃ শাহজাহান, মোঃ শফিকুল আলম, প্রকৌশলী ফখরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও দোয়া পরিচালনা করেন মোঃ আখতার হোসেন। আলোচনা শুরুর প্রথমে '৫২-র ভাষা শহীদ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সমস্ত শহীদদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন শেষে যথাক্রমে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আওয়ামী লীগের নেতা আফজাল হোসেন খান, এম আর ফয়েজ কামাল, জাফরুজ্জামান লাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কুয়েত শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রকৌশলী আবদুর রব। তারপর আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মোঃ শফিক, মোঃ শাহজাহান, রবিউল আলম রবি এবং প্রধান বক্তা মঠবাড়িয়া থানা আওয়ামী লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করে ১১ মাস কারা বরণকারী এমাদুল হক খান। আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ও সভার সভাপতি মোয়াজ উদ্দীন আহমেদ তার বক্তব্যে ১৯৪৮ সাল '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও তার ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা-পূর্ব বিভিন্ন সংগ্রাম, অধ্যায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। পরিশেষে সমস্ত আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও স্বাধীনতার সপক্ষীয়দের জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এ মুহূর্তে আহ্বায়ক কমিটিকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেন, যেকোনো মূল্যেই হোক আমরা আগামী নেতৃত্ব উপহার দেয়ার লক্ষ্যে আমাদের নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার পূরণ করবো। তিনি এ অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য আহ্বায়ক কমিটি, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, অঙ্গ সংগঠনসমূহ, পেশাজীবী সংগঠনসমূহ, মুক্তিযোদ্ধা, ব্যবসায়ীসহ সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জাহাঙ্গীর হোসাইন বাবলু
কুয়েত

মাদ্রিদ, স্পেন

২১শে মাদ্রিদে মাতৃভাষা দিবস

২১শে ফেব্রুয়ারি মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনাসভা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গীত ও সালাম সালাম, হাজার সালাম গান পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় অ্যাম্বাসির কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল আলম। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পড়ে শোনান রফিকুল ইসলাম। (কমার্স মিনিস্টার)। সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শওকত আলী, লোকমান হোসেন, আঃ কাইয়ুম, দুলাল, লিয়াকত সিকদার, শাহজাহান কবির ও আঃ জলিল চৌধুরী। চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক, শফিক। এই আত্মাহুতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দিনটিকে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি চেতনা আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দৃশ্যমান সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার জন্য প্রবাসী ভাইবোনদের আহ্বান জানান। মেহেদুল ইসলাম ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মুনাজাত করেন। অ্যাম্বাসির পক্ষ থেকে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

Abdul Jalil Chowdhury, C/Ampero 57-I Azq, 28012 Madrid, Spain

প্যারিস

পার্থ মজুমদারের অর্ধশতক

মূকাভিনেতা বিশ্ববিখ্যাত হলেও দেশে অচেনা হয়ে গেলেন...

যেতে যেতে কালের গর্ভে বিলীন হলো পার্থদার ৫০ বছর। পার্থদা বাংলাদেশের মূকাভিনয়ের পথিকৃত পার্থ প্রতীম মজুমদার। সুদীর্ঘকালের সাধনায় প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মূকাভিনয়ের সমন্বয়ে যিনি প্রায় এককভাবে মূকাভিনয়কে তুলেছেন এক চমৎকার মার্গে। জীবনের দীর্ঘ পরিক্রমায় এশিয়া থেকে আমেরিকা, তথা বিশ্বের বিভিন্ন দরবারে সবুজ-লাল পতাকাটি সম্মান ও সাফল্যের সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর শিল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতার এতোগুলো বছর পরেও খেলাধুলা থেকে শুরু করে শিল্প-সংস্কৃতি, রাজনীতি তথা সর্বক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য যেখানে হতাশাজনক। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুষ্টিমেয় হাতেগোনা কৃতী সন্তানের মধ্যে পার্থদা একজন। যিনি তার স্বক্ষেত্রে একজন দক্ষ, নীরব সাধক। অথচ আশ্চর্য হলেও সত্য যে, নিজ কর্মগুণে নিজ দেশের যে সুন্দর ভাবমূর্তি তিনি তুলে ধরেছেন এক সময়ে বিশ্বের হাটে হাটে। সেই স্বভূমে তিনি রয়ে গেলেন আজো অনাদৃত। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যাদের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা উচিত তাদের এই দুর্বোধ্য নীরবতা প্রশ্নবিদ্ধ। পার্থদার জীবনের অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে আসা উপলক্ষে বাংলাদেশের এবং ভারতীয় বাঙালিদের যৌথ উদ্যোগে প্যারিসে এক অনাড়ম্বর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ২৫ জানুয়ারি। এ উপলক্ষে লন্ডন প্রবাসী খ্যাতনামা গায়ক হিমাংশু গোস্বামী আগেই প্যারিসে এসে পৌঁছেছিলেন। চমৎকার কণ্ঠে আড়াই ঘন্টা যাবৎ উনি গেয়ে চলেন অসংখ্য মনকাড়া সব গান। এর মাঝে দেশাত্মবোধক কিছু গান শ্রোতাদের হৃদয় ছুঁয়ে যায়, অধিকাংশ শ্রোতা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। কঠিন কর্মময় প্রবাস জীবনে চমৎকার এই অনুষ্ঠানটি প্রবাসীদের মাঝে পুনর্মিলনের স্বাদ এনে দেয়। জয়তু পার্থদা!

ছবিতে শিল্পী হিমাংশু গোস্বামী, মূকাভিনেতা পার্থ প্রতিম মজুমদারের স্ত্রী জয়শ্রী মজুমদার, গিটারে রানা ও তবলায় কামাল

এস, আহমেদ, 36, Rue Des Sept Arpenats, 93500 Pantin, France

লন্ডন, গ্রেট ব্রিটেন

‘বাংলাদেশকে খুব মিস করি’ জয়শ্রী কবীর বললেন

মিস ক্যালকাটা। সত্যজিতের সীমাবদ্ধ ছবির নায়িকা। ছিলেন ঢাকায়, চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবিরের স্ত্রী হিসেবে। আবার কোলকাতা। কিছুদিন যেন হারিয়ে গেলেন। আছেন ’৮৬ সাল থেকে লন্ডনে অভিনয় করছেন, ছবি আঁকছেন মনজুরুল আজিজ পলাশ তার ‘খোঁজ’ পান এবং তার বাড়ির এক আড্ডার টেপ থেকে এই সাক্ষাৎকার। যার জন্য পলাশ বলেছেন, সাক্ষাৎকার ধারণ। তাঁর লেখা। পলাশের অভিজ্ঞতা হলো জয়শ্রী ‘সৌন্দের্যের সরলীকরণ’ নয়...

সাক্ষাৎকার ধারণ : **মনজুরুল আজিজ পলাশ**

শুধু সবুজ চোখের জন্য নয়, সবুজ চ্যাপ্টা ডানহিলে প্যাকেট তার পছন্দ এ কারণেও নয়- জয়শ্রী কবীর স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন শক্তিশালী শিল্পীসত্তার কারণেই। আজও সৌন্দর্য-মেধা-শিক্ষা-রুচি-সৃষ্টিশীলতার এক আশ্চর্য আলোচিত নাম জয়শ্রী। ১৯৬৮ সালে কোনো রকম প্রস্তুতি ছাড়াই ‘মিস ক্যালকাটা’ নির্বাচিত হয়ে যে মেয়েটি সবার নজর কাড়েন, সেই মেয়েটিই সবার মন কেড়ে নেন ১৯৭১ সালে সত্যজিৎ রায়ের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবিতে অভিনয় করে। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং একে একে সূর্যকন্যা (১৯৭৬), সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭), শহর থেকে দূরে (১৯৭৯), রূপালী সৈকতে (১৯৭৯), দেনা-পাওনা প্রভৃতি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাংলাদেশের প্রতিভাবান চলচ্চিত্র পরিচালক প্রয়াত আলমগীর কবীরের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন জয়শ্রী কবীর। ব্রিটেনে বাঙালি সমাজের প্রাণপুরুষ প্রয়াত তাসাদ্দুক আহমদ জয়শ্রী কবীরকে ‘দুই বাংলার যোগসূত্র’ হিসেবে অভিহিত করতেন। দুই বাংলার ভ্রমণ শেষে ১৯৮৬ থেকে জয়শ্রী তৃতীয় বাংলা লন্ডনে অভিবাসিত, স্থিত হয়েছেন। জীবনের এক ক্রান্তিকালে, জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে একদিন যে শিল্পী জীবনকেই বেছে নিয়েছিলেন সেই শিল্পী যে শিল্পের কাছেই বারবার ছুটে যাবেন তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আমরা অবশ্য কখনো কেউ আপাত চোখের আড়াল হলেই তাকে মনের আড়ালে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। আমাদের হাজারো ঔৎসুক্য থাকে কিন্তু আমরা ‘খোঁজ’ করি না কারো; আবার যাকে তৈরি বা কাছে পাই, সম্পর্ক করতে চাই অতি সংক্ষিপ্ত-তাড়াহুড়ার পথে, কখনো সংকীর্ণ চাহিদায় আমরা অধঃপতিতও হই। এ রকম অস্বস্তিকর-বৈরী-নিঃসঙ্গ প্রতিবেশে জয়শ্রীর প্রবাস জীবন, একক মাতৃত্বের মহান সংগ্রামের সময়টিও এক সময় পার হয়ে যায়। জয়শ্রী আবার বের হয়ে আসেন জয়শ্রী হয়ে, জাত শিল্পীর চরিত্র মেনে তিনি বারবার ফিরে আসতে চেয়েছেন অভিনয়ের কাছে, দর্শকদের কাছে। প্রবাসে প্রায় এক যুগ শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও মনটা পড়েছিলো সেই অভিনয়ের দিকেই। এ কথাও সত্য, বাছ-বিচারবিহীনভাবে তিনি অভিনয় করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেননি কিংবা সাড়া দেননি কোনো হালকা প্রস্তাবের। ইতিমধ্যে নিজেকে আরও প্রস্তুত করেছেন, অপেক্ষা করেছেন আরো ভালো সুযোগের। গত দুই বছর ধরে তার অভিনয় জীবন নতুন বাঁক নিয়েছে, আবার তিনি জ্বলে উঠেছেন বিবিসি’র মূল ধারার কিছু প্রোডাকশনে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করার মধ্য দিয়ে। ইতিমধ্যে একবার বাংলাদেশ ঘুরে এসেছেন, সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেছেন অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনার সম্ভাবনা নিয়ে। সম্প্রতি তার সাক্ষাৎকারও ‘বিমূর্ত এই রাত্রি আমার’ গানটির সমন্বয়ে নতুন মিউজিক ভিডিও একাধিকবার প্রচারিত হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের দর্শকরা আবার জয়শ্রী কবীরকে স্ক্রিনে ফিরে পেয়েছেন- জয়শ্রী ঘুচিয়ে দিতে চাইছেন মাঝখানের শূন্য বছরগুলোর বিস্তৃতি। প্রবাসী বাঙালি ও মূলধারার দর্শকদের কাছেও তিনি উপস্থিত হচ্ছেন বিবিসি’র ফিল্ম ও সিরিয়ালগুলোর মধ্য দিয়ে। জয়শ্রীর আরেকটি গুণের কথাও এই সুযোগে পাঠকদের জানিয়ে রাখি- তিনি কিন্তু চিত্রশিল্পী হিসেবেও আবির্ভূত হয়েছেন, কাজ

চিত্রশিল্পী হিসেবেও জয়শ্রী কবীর আবির্ভূত। কাজ করছেন ভিন্ন মাধ্যমে ‘এনকসটিক ওয়াক্স পেইন্টিং’-এ ছবি: ম আ পলাশ

করছেন ভিন্ন একটি 'এনকসটিক ওয়েক্স পেইন্টিংয়ে'। আগামী অক্টোবর মাসে লন্ডনে তার প্রদর্শনীও হতে যাচ্ছে এনএইচএস'র (ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস লন্ডন) আয়োজনে।

জয়শ্রীকে নিয়ে আলোচনা হয় যে, আরবান ইমেজের বাইরে তিনি যেতে পারেন না। সব সময় একটি আভিজাত্য ও গরিমার দেয়াল তার চারপাশে থাকে? -এ বিষয়ে জয়শ্রী নিজেও কথা বলেছেন। আমরা কিন্তু জানি, সব চরিত্রে সব শিল্পী সবসময় সমানভাবে উত্তীর্ণ নন, তবে সব মহৎ শিল্পীই চেষ্টা করেন। জয়শ্রীও চেষ্টা করেছেন তার অভিনীত চরিত্রগুলো ফুটিয়ে তুলতে। আবার তিনি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন অভিনয় জগতে।

সম্প্রতি জয়শ্রী কবীরের সঙ্গে এক সন্ধ্যায় তুমুল আড্ডা হয় তার লন্ডনস্থ বাসায়। আজকের এই সাক্ষাৎকারটি মূলত সেই আড্ডারই অংশ। জয়শ্রী যে কখনোই শুধু সৌন্দর্যের সরলীকরণ নয় তা তার সঙ্গে দু'মিনিট আলোচনা করলেই বেশ বোঝা যায়। মুখ টিপে, গালে টোল ফেলে হাসতে হাসতে, চা পান করতে করতে, কখনো গভীর সবুজ চোখ স্থির রেখে, সবুজ ডানহিলের চ্যাপ্টা প্যাকেট উজাড় করতে করতে, কখনো বাংলায়, কখনো ইংরেজিতে বিভিন্ন বিষয়ে চমৎকার কথা বলেছিলেন তিনি। টেপে ধারণ করা এই কথোপকথনের নির্বাচিত অংশ পাঠকদের জন্য পত্রস্থ করা হলো।

মনজুরুল আজিম পলাশ : আপনি কেমন আছেন? কেমন লাগে প্রবাস জীবন?

জয়শ্রী কবীর : ভালোই আছি...। প্রবাস জীবন অন্য যেকোনো জীবনের মতো ভালো-মন্দ মিশিয়ে, এর অ্যাডভান্টেইজও আছে, ডিসঅ্যাডভান্টেইজও আছে...।

ম.আ.প : অনেক সময় পাঠকদের আগ্রহ থাকে জানতে... একটু কি বলবেন আপনি অভিনয় জগতে কিভাবে এলেন...

জয়শ্রী : অভিনয় জগতে এসেছি অনেক আগে... মনে আছে ১৯৬৮তে আমি মিস ক্যালকাটা নির্বাচিত হই। ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি... তখনকার দিনে কোনো বাঙালি মেয়ে মিস ক্যালকাটা নির্বাচিত হয়নি বা এই ক্রাউনটা পায়নি... সে জন্য যখন আমি পেলাম বেশ সোরগোল পড়ে গিয়েছিলো কোলকাতায়। আমার বয়স কত? ১৬-১৭ হবে। তো এই বিষয়টা সত্যজিৎ রায় মানে আমাদের মানিকদার কানে যায় বা উনি শুনেন... তখন উনি আমার বাবাকে অনুরোধ করেন, আমাকে একবার দেখতে চান। তখন মানিকদা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' করছেন। একদিন দেখা হলো, অনেকক্ষণ গল্পটল্প হলো, তিনি বললেন, ঠিক আছে আমি খবর দেবো। প্রায় ১ বছর পর হঠাৎ একদিন মানিকদা মা'কে ফোন করেন, বলেন, আমি একটা ছবি করছি 'প্রতিদ্বন্দ্বী' নামে। প্রধান মেয়ে চরিত্রটা যদি জয়শ্রী করে। এর মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো। মা বললেন, ও শ্বশুরবাড়ি এলাও করে কি না করে, মানিকদা বললেন, আমাকে টেলিফোন নাম্বারটা দিন, আমি কথা বলে দেখি। ইনসিডেন্টলি ইটস সো হ্যাপেন্ড যে, যে ফ্যামিলিতে আমার বিয়ে হয়েছিলো মানিকদা'র মা আর আমার দাদী শাশুড়ি ছিলেন ফার্স্ট কাজিন। আমার দাদা শ্বশুরও বেঁচে ছিলেন তখন, হি ওয়াজ এ ভেরি প্রগ্রেসিভ মাইন্ডেড পারসন। তিনিও সমর্থন করেন। তারপরই আমি আবার মানিকদার সঙ্গে দেখা করি, স্ক্রিন টেস্ট হয়, এভাবেই শুরু হয়... কাজ শুরু হয়ে যায়।

ম.আ.প : 'প্রতিদ্বন্দ্বী' কি প্রথম চলচ্চিত্র অভিনয় ছিলো আপনার?

জয়শ্রী : হ্যাঁ, 'প্রতিদ্বন্দ্বী'ই ছিলো প্রথম, যদি মানিকদা না হতো তাহলে মনে হয় না আমার ছবিতে আসা হতো না। অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অব টাইম।

ম.আ.প : কিন্তু 'প্রতিদ্বন্দ্বী'তে বোঝা যায়নি যে আপনার প্রথম কাজ।

জয়শ্রী : এটা তো আই উড সে দ্য ক্রেডিট ওয়াজ গো টু অ্যাবসুলেটলি টু মানিকদা। তিনি রোল চ্যুজ করতেনই এ রকম যে 'কেয়া' চরিত্রটা যেটা দেখানো হয়েছে ওটা অ্যাগজ্যাক্টলি হোয়াট আই ওয়াজ অ্যাট দ্যাট পার্সন অব টাইম। সেখানে আমার তেমন একটা নতুন কিছু করতে হয়নি। হ্যাঁ, ডায়লগগুলো, ইনসিডেন্সগুলো রপ্ত করতে হয়েছে, আই ওয়াজ সো গ্রেটফুল যে মানিকদার হাত দিয়ে আই কুড কাম। আমি অসম্ভব ক্যামেরা সাই ছিলাম। কেউ আমার স্টিল ফটোও নিতে পারতো না, আমি পাথরের মতো হয়ে যেতাম। মানিকদার হাত দিয়ে যে আমার সাইনেসটা চলে যাওয়া কিংবা ক্যামেরা বিকেইম মাই সেকেন্ড লাইফের সমস্ত কৃতিত্ব মানিকদার।

ম.আ.প : মঞ্চ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

জয়শ্রী : এটা দুদিকে বলা যায়। যখন আমি খুব ছোট.. আমি বেঙ্গল মিউজিক কলেজে নাচ শিখতাম, অনেকেই জানেন না অল্প বয়স থেকেই আমি প্রফেশনাল স্টেজে পারফর্ম করতাম অ্যাজ এ ড্যান্সার। প্রতিদ্বন্দ্বীর পর যখন আমি খুব ব্যস্ত হয়ে যাই তখন আর ড্যান্স প্রোডাকশনে কাজ করতে পারতাম না। কিন্তু সঠিক হিসেবে যদি বলেন- মঞ্চ আমার প্রথম প্রফেশনাল স্টেইজ। আপনি নিশ্চয় জানেন কোলকাতার প্রফেশনাল স্টেজ গোজ ব্যাক এ লং হিস্ট্রি। আমাদের ওখানে বলা হয় যারা স্টেজে কাজ করেনি তারা আর্টিস্টই হয়নি। আমার প্রথম স্টেজে হাতেখড়ি হচ্ছে 'বিবর' বলে সমরেশ বসুর খুবই কনট্রোভার্সিয়্যাল নাটক, ইট ওয়াজ এ ব্যান নভেল এবং সেটা রবি ঘোষের ডিরেকশনে ছিলো... আমার প্রথম মঞ্চ নাটক।

ম.আ.প : আপনি তো খুবই সৌভাগ্যবান বলতে হয়। চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়, মঞ্চে রবি ঘোষের সঙ্গে প্রথম কাজ... এদের সান্নিধ্য পাওয়া, আরেকটু স্মৃতিচারণ করবেন রবি ঘোষ সম্পর্কে?

জয়শ্রী : রবিদা আমার... আমি বলতে পারি আমার ৩ জন গডফাদার ছিলো। আজ আমি যতোদূর এসেছি তার জন্য এই ৩ জনকে কৃতিত্ব দেই। এক ছিলেন সত্যজিৎ রায়, এক ছিলেন রবি ঘোষ, আর একজন উত্তম কুমার। রবি ঘোষ... হি ওয়াজ নট অনলি মাই ম্যানটোর... বাট আই অ্যাম সো গ্রেটফুট অ্যান্ড সো প্রাউড যে আইপিটিআই গ্রুপের নাম আপনি শুনে থাকবেন যেখানে রবি ঘোষ, উত্তম কুমার শুধু নয়, কোলকাতার বিখ্যাত সব অভিনেতা-অভিনেত্রী সেই গ্রুপ থেকে এসেছেন। আমাকে রবিদা হাতে ধরে সব শিখিয়েছে, ভয়েজ কি করে থ্রো করতে হয়, স্টেজ মুভমেন্ট কি করে করতে হয়। রবিদা জানতো আমার স্টেজের বিরাট ফ্রাইট ছিলো... আমাকে যদি স্টেজ থেকে কেউ কিছু আনতে বলতো তাহলেও আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো। তো রবিদা এক দিন আমাকে বলেছিলেন, জয়শ্রী খুব ভালো স্ক্রিপ্ট পেয়েছি, এসে শুনে যা। আমি ভেবেছিলাম ফিল্মের স্ক্রিপ্ট, আর রবিদা যখন বলেছেন তাহলে তো কথাই নেই...। আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড... ইট ওয়াজ অ্যা কম্পলিকেটেড ক্যারেক্টার। রবিদা বললেন, করবি তো? বললাম অবশ্যই। রবিদা জানালেন এটা কিন্তু মঞ্চ নাটক। আমি বললাম, অসম্ভব, আমাকে দিয়ে স্টেজ হবে না। আই ওয়াজ লাইক হিটিং দ্য ব্রিকস্, তারপর যেসব আর্টিস্ট কাজ করবে শুনলাম, ইম্পসিবল। আমিই ছিলাম একমাত্র যার কোনো স্টেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলো না। রবিদা বললেন, ঠিক আছে, তুই যদি না পারিস তাহলে আমিই বলবো তোকে না করতে, আমার বিশ্বাস তুই পারবি। দ্য ওয়ে হি মল্ডেড মি... অসাধারণ। সত্যি কথা বলতে কি যারা ওই প্রোডাকশন দেখেছে বা জড়িত ছিলো তারা বলেছে, ওই ক্যারেক্টারটা এমনভাবে ইনভলব করেছিল, দ্যাট ইট বিকেইম অ্যা স্টার অব দ্য শো.. এটা নিজের কথা বলে বলছি না, পরবর্তীতে আমার অনুপস্থিতির কারণেই বিবর বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। আমি বাংলাদেশে চলে যাই এবং সেখান থেকে সিডনি চলে যাবার কথা ছিল। ওই রকম একটা মেজর প্রোডাকশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল কারণ

আমি যে ক্যারেক্টার করেছিলাম- নো ওয়ান কুড রিপ্লেস দ্যাট ক্যারেক্টার।

ম.আ.প : গুরুত্বপূর্ণ ছিল চরিত্রটি?

জয়শ্রী : গুরুত্বপূর্ণ বড় কথা নয়, ঐ চরিত্রটা একমাত্র আমাকেই আইডেন্টিফাই করতে পারতো অডিয়েন্স। ওই 'নীতা'র চরিত্রটি আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেনি। রবিদাও নাকি বলতেন, একটি চরিত্রের জন্য এতো বড় একটা প্রোডাকশন বন্ধ করে দেয়াটা আমাদের স্টেজ হিস্ট্রিতে আর সম্ভবত ঘটেনি। আমি এবারও কোলকাতায় গিয়ে বলেছি, রবিদার সম্মানে আমি প্রয়োজনে আবার বিবর করতে যেতে রাজি আছি।

ম.আ.প : আমরা একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি, ১৯৬৮ সালে আপনি মিস ক্যালকাটা নির্বাচন হন, এ বিষয়টা অনেকেই কিন্তু বিস্তারিত জানে না...

জয়শ্রী : আসলে এটা একটা ফান, ফান ইন দ্য সেন্স। আমি আর বাবা এক জায়গায় খেতে গেছি, ওখানে মিস ক্যালকাটা কনটেস্ট হচ্ছে। প্রতিযোগিতা ছিল এইটিন প্লাসের জন্য, আমার বয়স তখন ১৬। বাবা বললেন, তোমাকে ওরা নেবে না। আমি বললাম, তবু যাই, দেখি না। বাবাকে আমি খুব হ্যান্ডেল করতে পারতাম। ঘ্যান ঘ্যান করতে তাৎক্ষণিকভাবেই আমি প্রতিযোগিতায় যোগ দেই। আমিন সিয়ানি বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন, আমি তাকে অনুরোধ করি। আমাকে ওরা এলাও করে। আমি অন্য প্রতিযোগীদের সঙ্গে গেলাম, ডিনার করলাম, সবার দিকে তাকালাম। সবাই সেজেগুজে বসে আছে। আমি একটা প্লেইন শাড়ি পরা ছিলাম। প্রস্তুতি তো ছিল না। আমার মাও জানতেন না এসব আমরা করেছি। যেহেতু প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবো ধারণাই ছিল না, সুতরাং মা কোনো দিনই জানতে পারবেন না। তিনটি রাউন্ড ছিল। ও-মা দেখলাম প্রথম রাউন্ডে আমি রয়ে গেছি। তারপর সেকেন্ড রাউন্ড, সেখানেও রয়ে গেছি। আমি নিশ্চিত যে থার্ড রাউন্ডে থাকবো না। ফার্স্ট রানারআপ ডেকেছে, সেকেন্ড রানারআপ ডেকেছে, মিস ক্যালকাটা যখন অ্যানাউন্স করছে একবার ডেকেছে, দু'বার ডেকেছে, আমি বসেই আছি। ভুলেই গেছি আমার নাম্বার কত ছিল। পাশ থেকে একজন বলছে, জয়শ্রী, জয়শ্রী ইয়োর নাম্বার ইজ সেভেনটিন, দে কলিং ইউ, দে কলিং ইউ। আই ওয়াজ লাইক এ ডেইজ, আমি কেমন করে সেখানে উঠেছি বা কারা টেনে নিয়ে গেছে আজ আর মনে নেই। বেসিক্যালি আই ওয়াজ অ্যানাউন্সড মিস ক্যালকাটা। ফ্লাশ লাইট, ক্যামেরা, ভিড়ভাট্টার মধ্যে তখন শুধু বাবাকে খুঁজছি। সেই সেন্সে মিস ক্যালকাটা কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টাল।

ম.আ.প : আপনার এই মিস ক্যালকাটা সবার কাছেই ইন্টারেস্টিং মনে হবে। আচ্ছা এবার আমরা আবার একটু প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়ে আলোচনা করি। প্রতিদ্বন্দ্বী তো সামগ্রিক বিচার মানে চলচ্চিত্র হিসেবে, আপনার চরিত্র সব মিলিয়ে চমৎকার প্রোডাকশন ছিল। তো এই প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার পরবর্তী অভিনয় জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিলো?

জয়শ্রী : আপনি তো বুঝতে পারছেন যে, 'প্রতিদ্বন্দ্বী' মানিকদার ছবি ছিল। এর আগে মেয়ে চরিত্রগুলো করেছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, অপর্ণা সেন। পরে আমাকে নিয়ে এলো। এটা একটা ম্যাসিভ কাভারেজ ছিল, প্রেস মিডিয়া সব জায়গায়। সত্যজিৎ রায় নতুন মুখ আনা- সবাই তখন আগ্রহী হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক কাভারেজও হয়।

ম.আ.প : ধৃতিমান কিন্তু একই সময় আত্মপ্রকাশ করে।

জয়শ্রী : হ্যাঁ, আমরা দু'জনে একই সঙ্গে একই ছবিতে আত্মপ্রকাশ করি। তো সেই সেন্সে প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বীর সাকসেস, মানিকদার আর্টিস্ট, প্লাস মিস ক্যালকাটা সব মিলিয়ে আমার শুরুটা ছিল খুব উপর থেকে। আমার মনে আছে, আমি যখন ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড আনতে গেলাম, রাজেশ খান্না ছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ম্যাডাম উই অল স্টার্ট ফ্রম দ্য বটম লেভেল টু রিচ সত্যজিৎ রায়, লুক অ্যাট ইউরসেলফ, ইউ স্টার্ট ফ্রম সত্যজিৎ রায়। নাউ ইউ হ্যাভ টু ক্লাইম্ব ডাউন টু দ্য স্টেয়ার্স টু দ্য বটম। তখন অতো বুঝতে পারিনি। আসলে কিছুটা সত্যি, আমি বটম বলবো না কিন্তু এ কথা সত্য, তখনকার দিনে একজন আর্টিস্টের ফার্স্ট অ্যান্ড লাস্ট উইশ ছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করা। সেই অর্থে পরে যাদের সঙ্গে কাজ করেছি সবাই সত্যজিৎ রায়ের তুলনায়... চিন্তা করে দেখুন। এ কারণে আমার ঠিক যুদ্ধটা করতে হয়নি। সাকসেসের পেছনে দৌড়াতে হয়নি। আই নেভার হ্যাড টু লুক ব্যাক।

ম.আ.প : আপনার অভিনয় পর্বটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখবো পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশ দুটো পর্বে তা বিভক্ত। তো একটা অ্যাডভান্টেজ নিশ্চয় ছিল যে, মাধ্যমটা বাংলা। সেদিক দিয়ে তা বিরোধার্থক ছিলো না। আমরা আপনার কাছ থেকে বাংলাদেশ পর্বটা শুনবো।

জয়শ্রী : এই প্রসঙ্গে আসার আগে আমি আপনাকে আরেকটি বিষয় জানাই। আমি আর রাখি গুলজার, আমরা দু'জন আর্টিস্ট কিন্তু রিজিওন্যাল ফিল্মেও কাজ করেছি। আমি শুধু পশ্চিম বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিলাম না। ভূপেন হাজারিকার অসমিয়া ছবিতেও কিন্তু কাজ করেছি। সো মাই এক্সপেরিয়েন্স গোজ নট ওনলি ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইট ওয়েন্ট বিয়ন্ড। নাউ কামিং টু দ্য ফ্যাক্ট অব বাংলাদেশ। বাংলাদেশেও কিন্তু সত্যি কথা বলি, ছবি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাইনি। আমাদের আদি বাড়ি কিন্তু চাটগাঁ। আমি বাংলাদেশে গিয়েছিলাম মূলত চট্টগ্রাম বেড়াতে আর কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত দেখতে। আমার সুপ্ত ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশ ঘুরবার... বাংলাদেশ ছিল আমার জন্য সেই অর্থে স্বপ্নভূমি।

ম.আ.প : যারা সূর্যকন্যা, সীমানা পেরিয়ে দেখেছেন তারা জানেন যে, এই ছবিগুলোতে আপনার চরিত্র কিন্তু এই জায়গাগুলো ভ্রমণ করেছে এবং ছবিগুলো প্রচন্ডভাবে জনপ্রিয় হয়। তো এই কাকতালীয় বিষয়টি কি চমৎকার নয়, আপনার ভালো লাগার জায়গাগুলোতে শুটিং করতে পেরেছেন?

জয়শ্রী : হ্যাঁ, এ বিষয়টি তো চমৎকার ছিল। মানিকদা কিন্তু আলমগীর কবীরের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, প্রশংসা করেছিলেন। কবীর তখন একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য মানিকদাকে বলেছিলেন।

ম.আ.প : অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপনি কি বিশেষ কোনো চরিত্র প্রাধান্য দেন? পছন্দ করেন?

জয়শ্রী : দেখুন, অভিনয় আমার কাছে বেসিক্যালি ডিপিকটিং লাইফ, আমাদের চারপাশের চরিত্রগুলোকেই প্রতিফলন করা। (একটু সময় নিয়ে) হ্যাঁ, এটা ফুটিয়ে তোলার দায়িত্ব যেকোনো আর্টিস্টের। আমি যেহেতু টাইট, না টাইট বলবো না, পিপল হ্যাজ সিন মি মোর ইন আরবান গেটআপ, সে জন্য... আর যেহেতু আই অ্যাম অ্যান আরবান প্রোডাক্ট, আমি একদম মেট্রোপলিস কোলকাতার বর্ন এন্ড ব্রটআপ মেয়ে। ফলে আমি আরবান ক্যারেক্টারগুলোর সঙ্গে বেশি আইডেন্টিফাই করতে পারি। আমার মতে, সব আর্টিস্টের চেষ্টা করা উচিত...

ম.আ.প : চেষ্টাটা তো সব মহৎ শিল্পীরই থাকে। তারপরও বলছি, আপনি নিজে আপনার অভিনয়ের আত্মসমালোচক হন। আপনার কখনো মনে হয়েছে যে এক ধরনের আভিজাত্য থেকে বেরিয়ে আসতে আপনার কষ্ট হচ্ছে?

জয়শ্রী : না, আভিজাত্য থেকে বেরিয়ে আসতে আমার কষ্ট হয় না। বাংলাদেশের কথা বলছি, গ্রাম- বাংলার ভাষা রপ্ত করতে হয়তো আমার কষ্ট হবে। যদি উদাহরণ দেই, মোহনা যদি আপনি দেখে থাকেন তাতে গ্রাম-বাংলার একটি মেয়ের ভূমিকা আমি করেছিলাম, আমাকে কবীর বলেছিল যে তোমার ফর্ম কিন্তু তোমাকেই ভাঙতে হবে। তোমার আরবান ইমেজ তোমাকেই ভাঙতে হবে, আমি চেষ্টা করেছি। হয়তো জাস্টিস করতে পেরেছি। কিন্তু আমি আসলে তৃপ্ত নই সেভাবে।

ম.আ.প : এই অতৃপ্তিটা জরুরি, তবু আপনি কি একটু বলবেন আপনার কাছে

আপনার অভিনীত উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো কি কি?

জয়শ্রী : দেখুন যখন যেটা করি তখন সেটাই উল্লেখযোগ্য মনে হয়। বাট আই স্টিল ফিল দ্য বেস্ট হেজনট কাম এজ ইয়েট, আই স্টিল ওয়েটিং ফর দ্য বেস্ট।

ম.আ.প : আপনি নিশ্চয় নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখেন, জানি খুব কঠিন পছন্দের চলচ্চিত্র চিহ্নিত করা। প্রতিনিয়ত তা পরিবর্তন হয়। তবু কিছু পছন্দের চলচ্চিত্র বলুন, আন্তর্জাতিক পরিসরেই।

জয়শ্রী : আমি ছবির এডিক্ট, আমি না খেয়ে ছবি দেখতে পারি। প্রচুর অসাধারণ ছবি আছে। কিছু ছবি ভালো লাগে টেকনিক্যাল কারণে, কিছু অ্যাকটিংয়ের কারণে, কিছু ভালো পরিচালনার জন্য। কয়েকটি ছবি বলি, ডেড ম্যান ওয়াকিং বলে একটি ছবি আছে, সুজান সারেনডন বলে একজন শক্তিশালী অভিনেত্রী আছেন... অনবদ্য লেগেছে ছবিটি, ৭/৮ বার দেখেছি। দ্য ইউজ্যুয়েল সাসপেক্ট নামে একট ছবি আছে, তারপর আর ধরুন আর কার কথা বলবো, নিকোলাস কেইজ, জন ট্রাভলটার ছবি যদি দেখেন, আলপাচিনো, ক্যাসিনোতে দেখেন... (একটু বিরতি) আমি পুরনো ছবি প্রচুর দেখি। লার্না টার্নারের একটা ছবি দেখেছিলাম ম্যাডাম এক্স নাম, অনবদ্য অভিনয়। জুলিয়া রবার্টসও খুব পছন্দ।

ম.আ.প : ঠিক আছে, আমরা কি একটু চলচ্চিত্রকার বিষয়ে কথা বলতে পারি? সত্যজিৎ রায় ছাড়া মানে অন্যদের ব্যাপারে জানতে চাইছি।

জয়শ্রী : দেখুন, ঐ সময় ঋষিকেশ মুখার্জী ছিলেন, গুলজার ছিলেন, বিমল রায় ছিলেন, মেহবুব ছিলেন, রাজকাপুর ছিলেন। কোলকাতায় মৃণালদা ছিলেন, ঋত্বিকদা ছিলেন। ঋত্বিকদা'র সঙ্গে একটা ছবিতে কাজ করার কথা ছিল, কিন্তু যদি তিনি মারা না যেতেন, হয়তো দ্যাট কুড বি মাই সেকেন্ড বেস্ট ফিল্ম। তারপর তরুণ জমুদার ছিলেন, তপন সিনহা ছিলেন, অজয় রায় ছিলেন, পীযূষ বোস ছিলেন যার ছবি আমি করেছি, ইফ আই নেইম ইট, তখন ছিল কি উই হ্যাড এ হোল হোস্ট অব ডিরেক্টর।

ম.আ.প : বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে...

জয়শ্রী : বাংলাদেশে যখন আমি যাই তখন বেশ কয়েকজন ছিলেন। কবীর ছাড়াও সেখানে আমজাদ হোসেন ছিলেন, সুভাষ দত্ত ছিলেন, আব্দুল্লাহ আল মামুন ছিলেন, আই অ্যাম গিভিং ইউর মেজর ক্লাস্টার অব ডিরেক্টরস। এরা সব ধরনের ছবিতেই ভালো করেছে। আমি জহির রায়হানের কথাও বলবো, যদিও ওনাকে দেখিনি, ওনার কাজ দেখেছি। সো ইন হিজ টাইম, ইন হিজ ফিট- হি ওয়াজ এ গ্রেট। সেই সময় ভারত-বাংলাদেশে আসলেই উল্লেখযোগ্য পরিচালকরা ছিলেন।

ম.আ.প : বাংলাদেশ বললেই কি মিস করেন সবচাইতে বেশি?

জয়শ্রী : বাংলাদেশকেই মিস করি। দেশ হিসেবে মিস করি, মানুষ হিসেবে মিস করি, প্রকৃতি মিস করি, এতো সবুজ এতো বিউটি-পৃথিবী ঘুরেও আমি এই সৌন্দর্য পাইনি, আমি এখনও বাংলাদেশে ফিরে যেতে চাই।

ম.আ.প : আপনি কিছুদিন আগে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন, কোলকাতায় গিয়েছিলেন। অভিনয়, পরিচালনা-প্রযোজনায় আপনার আবার সংশ্লিষ্ট হবার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

জয়শ্রী : অনেক দিন পর আমি গেলাম। এবার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বেশ সরাসরিভাবে। জানার জন্য কারা এখন কাজ করছে, কাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবো। পুরনোদের মধ্যে অনেকেই নেই। ফিডব্যাক ওয়াজ ট্রিমেন্ডাজ। আমাকে সবাই স্বাগত জানিয়েছে। অনেক সম্ভাবনা আছে কাজ করবার।

ম.আ.প : হ্যাঁ, আপনার ঢাকার সফর খুব উষ্ণ ছিল, কার্যকরীও নিশ্চয় ছিলো।

জয়শ্রী : হ্যাঁ, অনেক অফার এবারও এসেছে। কিন্তু আমাকে সব সময়ই অডিয়েন্সের এক্সপেকটেশন চিন্তা করতে হয়। সীমানা পেরিয়ে, সূর্যকন্যা, রূপালী সৈকতে ইত্যাদি ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে একটা মান প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। আই হ্যাভ টু ডু সামথিং, আইদার ইট হ্যাজ টু বি দ্য সেম স্ট্যান্ডার্ড অর বেটার দ্যান দ্যাট, আদারওয়াইজ কিন্তু না করাই ভালো। এ কারণে আমি একটু ধীরস্থির এবং সতর্ক থাকছি। আমাকে কে ডিরেক্ট করবে? এটা অবশ্যই চিন্তা করবো। এর মধ্যে অবশ্য একটা ভালো অফার এসেছে।

ম.আ.প : বলবেন একটু?

জয়শ্রী : ইটস অ্যা মাদার অ্যান্ড সানস্ রোল পার্সিয়ালি বেইজ অন মাই লাইফ অ্যাজ এ সিঙ্গেল প্যারেন্ট। আমি স্ক্রিপ্টের অপেক্ষা করছি।

ম.আ.প : আপনার সাম্প্রতিক কিছু কাজ সম্পর্কে আমাদের বলুন...

জয়শ্রী : গত দু'বছর ধরে আমি ব্রিটেনের মূলধারার কিছু ফিল্ম, সিরিয়াল, মঞ্চ নাটকের সঙ্গে কাজ করছি। বিবিসির প্রোডাকশন 'ইংল্যান্ড এক্সপেক্টস', 'টু মিনিটস', 'নিউ ট্রিক্স' ইত্যাদির সঙ্গে কাজ করেছি। সোহো থিয়েটারে নীল বিশ্বাসের একটি প্রোডাকশনেও কাজ করেছি। এখন অভিনয় এবং এ সম্পর্কিত ফিল্ডেই সক্রিয় থাকতে চেষ্টা করছি।

ম.আ.প : আপনি কিভাবে অবসর কাটান? আমরা জানি আপনি ছবি দেখেন বা চিত্রশিল্পী হিসেবেও আপনার সময় কাটে, এ ছাড়া আর কিছু করেন?

জয়শ্রী : অবসর সময়ই দেখি না। আমার তো মনে হয় ২৪ ঘন্টা হলেও আমার জন্য কম হয়ে যায়। এ দেশে সব নিজের করতে হয়। আই লাভ পেইন্টিং, পড়তে ভালোবাসি। বেশ কিছু অর্গানাইজেশনের সঙ্গেও আমি জড়িত, এগুলো মিলিয়ে, ছেলেকে বড় করা ইত্যাদিতে সময় চলে যায়।

ম.আ.প : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনার এতো সময় নিয়েছি বলে।

জয়শ্রী : আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, এতো সময় নিয়ে এতো কষ্ট আপনিও স্বীকার করেছেন।

জার্মানি

কি চাই এখানে

Ambieute পৃথিবীর বৃহত্তম আন্তর্জাতিক কনজ্যুমার প্রদর্শনী গত ২০-২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ হয়ে গেলো। আটশ' বছরের ঐতিহ্যবাহী ফ্রাঙ্কফুর্টের এই প্রদর্শনীতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, চীনসহ প্রায় ১০০ দেশের ৫০০০-এর মতো প্রতিষ্ঠান তাদের নতুন অত্যাধুনিক পণ্যসামগ্রী প্রদর্শিত হয়। Ambieute মূলত 'World of Table, Kitchen & Houseware', 'World of Gifts unlimited' and 'World of interiors' তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি উন্নতমানের জিনিসপত্র দেখা যায়। আমাদের দেশের আড়ং, নিপুণ, শাইনপুকুর, মন্নু সিরামিক, সৃষ্টি ইত্যাদিসহ প্রায় ডজনখানেক প্রতিষ্ঠান তাদের সামগ্রী প্রদর্শন করে। উন্নত দেশের পাশাপাশি নিজের দেশের পতাকাকে উড়তে দেখে বড় গর্ববোধ করেছি। যার কারণে গিয়েছিলাম মাতৃভূমির টানে দেখতে আমাদের স্টলগুলো। কিন্তু গিয়ে এক মধুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হলো। বাংলাদেশ স্টলের সামনে যাওয়ার পর একজন ভদ্রলোক (?) এগিয়ে এসে আমার বন্ধুকে বললেন 'কি চাই এখানে?' অর্থাৎ তিনি কি ভেবে কেন জিজ্ঞেস করলেন অভদ্রভাবে এটা বোঝা কঠিন। আমরা যেন কোনো ভিক্ষুক বা টোকাই, তার কাছে সাহায্যের জন্য গেছি। যেটা আমাদের দেশে ক্রেতাকে করা হয়। কেন আমাদের এই মনমানসিকতা? উনি হয়তো বা জানেন না, যেখানে তিনি এসেছেন সেখানে বলা হয় Kunde ist Konig, অর্থাৎ 'ক্রেতাই রাজা'। লাখ লাখ টাকা খরচ করে কি শিখে গেলেন আপনারা? আর দেশ আপনাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে! এখানেই আমাদের পিছিয়ে পড়া। আপনারা একটুও এগুতে পারছেন না।

রাহাত হোসেন (লিটন), Gallus, Frankfurt/M, Germany